ইউনিট
১৩

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সমাজ

ভূমিকা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থার অন্যতম ধারনা হল বিশ্বায়ন (Globalization) । তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বায়নের ধরনা একবিংশ শতাব্দীর ধারণার সাথে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। অতীতে বিশ্বায়ন বলতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্ড়রকে ধরা হয়েছিল। বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বায়ন এর প্রভাব বা সম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব অতীতেও ছিল। তবে অতীতে বিশ্বায়ন এর যে প্রভাব তা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের বিপরীতে অবস্থা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠান্ডা লড়াই (Cold War) বিশ্বায়নের ভিত্তি রচনা করেছিল।

ঠান্ডা লড়াইয়ের পরবর্তী যুগে বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিকশিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা মিখাইল গরবাচেভের 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাসনস্ত' নীতি থেকে। গরবাচেভ তার নীতির মাধ্যমে চেয়েছিলেন বিশ্বশান্তি,বৃহৎশক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি। এছাড়া তিনি এ নীতির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার চিন্তা–ভাবনা হিতে বিপরীত হয়েছিল। অনেকের মতে, এটা ছিল তাঁরা একজন পাকা জুয়ারির ভুলে চাল দেওয়ার সমতুল্য। সোভিয়েত নেতার ভুলের সুযোগ গ্রহন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র ডব্লিউ বুশ বিশ্বায়নের ধারণাকে নতুন মোড়কে উন্মোচন করেন। যার ফলে অল্প দিনের মধ্যে বিশ্বায়নের ধারণা গোটা বিশ্বে নতুন আদিকে বিকাশ লাভ করেছিল।

বিশ্বায়নের সুবাদে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিকাশ সাধিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে মানব সভ্যতা নবতর আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের ধারণায় সারা বিশ্বের বাজার এখন সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যে দেশ যত মানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন করতে পারছে, সেদেশ তত সম্পদশালী দেশে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে যারা মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না, তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকছে। তবে বর্তমানে বিশ্বায়নের সুফল থেকে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো।

বিশ্বায়নের ধারণা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হয়তোবা সময়ের পরিবর্তনে এর প্রকৃতিগত পরিবর্তন হবে।

পাঠ-১: বাংলাদেশের সমাজ ও বিশ্বায়নঃ প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের প্রভাব নির্ণয় করতে পারবেন।

বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বিশ্বায়নের প্রধান তাত্ত্বিক রোলান্ড রবার্টসন বলেন 'বিশ্বায়ন হল বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতাঃ। স্যাক্থু বলেন-"বিশ্বায়নকে বলা হয় আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং নিমিত্ত।" মার্টিন আলব্রো বলেন বিশ্বায়ন হল একটি সামগ্রিক কমিউনিটির মধ্যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া'। এন্থনি গিডেন্স বলেন 'বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের প্রগাঢ়করণ।

অতএব, বিশ্বায়ন হল বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগের একটি প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য ধারণা। যা সারাবিশ্ব জুড়ে একই ধরনর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং একই সাংস্কৃতিক নকশা তৈরি করে দিচ্ছে, এবং দূর্বল করে দিচ্ছে জাতি রাষ্ট্রকে এবং পশ্চিমারূপ ধারণ করছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। তাই বলা যায় Globalization হল বিশ্বব্যাপী একটি Global Economy গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজিবাদের সর্বশেষ সংযোজন।

বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ

প্রথমত ঃ ভৌগোলিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে সামাজিক নতুন বিন্যাস যার মাধ্যমে দূরের মানুষের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। এ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার নতুন বিন্যাসও তৈরী হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশ্ব সামাজিক সম্পর্কের এবং বিনিময়ের ব্যাপ্তির গভীরতা, গতি এবং প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তৃতীয়ত ঃ নতুন নতুন নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ গ্রন্থী সৃষ্টি হচ্ছে। স্যাব্রয়েল ক্যাসেল এবং এ্যান্থনি গিডেলের মতে জ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

চতুর্থত ঃ বিশ্বায়ন কোন একমুখী প্রক্রিয়া নয়। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া এর সাথে যুক্ত। প্রথমত, বিশ্বমুখীতা এষড়নধষ যার মাধ্যমে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি সমরূপ ধারণ করছে। দ্বিতীয়ত, স্থানিকতা খড়পধষ যার মাধ্যমে প্রান্তিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতির গুরুত্ব অর্জন করে এবং শক্তিশালী হয়। যেমন বিলুপ্ত প্রায় ভাষাগুলোর প্রতি এখন নতুন করে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে এবং সেগুলোকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বিশ্বায়ন এর প্রকৃতি ও স্বরূপ

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যদিও একটি সর্বাত্মক প্রক্রিয়া তবও সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর প্রধান প্রকৃতিগুলো বিশ্লেষণ করা হল ঃ

বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাণিজ্যিক উদারীকরণ, বিনিয়ন্ত্রন ও উন্মুক্তকরণ। এ উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় আমদানির উপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে দেশগুলো বাধ্য হচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানির কাজকর্ম ও মহাজনী মূলধনের আদান-প্রদানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। অবাধ বাণিজ্যের প্রসার পৃথিবীর দেশগুলোর সীমারেখাকে যেন বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া পুঁজি ও পণ্যের চলাচল অবাধ করলেও শ্রম শক্তির ক্ষেত্রে তা মোটেও ঘটেনি, বরং অভিবাসন আইন এবং বিদেশী শ্রমিকদের কাজের শর্ত এরকম কঠিন করা হচ্ছে যাতে তৃতীয় বিশ্বের শ্রমশক্তি উন্নত বিশ্বে প্রবেশ করতে না পারে। আমদানির ক্ষেত্রেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পন্য যাতে অবাধে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য শ্রম মান, শিশুশ্রম, পরিবেশ মান ইত্যাদি আরোপ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পণ্য চলাচলে কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে শিশু শ্রম, চিংড়ি শিল্পে পরিবেশ মান বিষয়ক প্রতিবন্ধকতা আরোপের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষিতে বিশ্বায়নের 'প্রক্রিয়া দেশের জীব বৈচিত্রের অবলুপ্তি ঘটাচ্ছে।

সন্দেহাতীতভাবে আমরা এক নতুনকালে বাস করছি যে কালের অপর নাম বিশ্বায়ন। সংগত কারণেই বিশ্বায়ন আজ প্রচন্ড বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এর গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য তৈরি হচ্ছে। বিশ্বায়নের ইতবাচক দিক সম্পর্কে নতুন তথ্য-প্রযুক্তি বর্তমান-কালের অর্থনীতিতে এমন এক গতির সঞ্চার করেছে; যা অন্য কোন কালের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কম্পিউটারের মাউসের একটা ক্লীকের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্যিক লেনদেন হচ্ছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুকূলে বলা হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বায়ন যে অর্থ-বাণিজ্যিক পরিবর্তনের সূচনা করছে তা কেবল নতুন নয়। বৈপ্লবিকও বটে।

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিয়েও চলছে নানারূপ আলোচনা-পর্যালোচনা। বিশ্ব বর্তমানে যে ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে তাতে বাংলাদেশের পক্ষে বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থার বাইরে থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য আজ একট বড় চ্যালেঞ্জ এটি স্বীকার করতেই হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার জের ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলা যায় যে, Globalization পুঁজিবাদের নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের একটি প্রক্রিয়া বা অর্থনৈতিক কৌশল। উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হলেও এখন চলছে বিশ্বে নয়া উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের লগ্নি পুঁজির যুগ। সেদিনকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ আর সৈন্যসমন্ড় দিয়ে দেশ দখল করে শাসন ও শোষণ করে না। এখন তারা করে লগ্নি পুঁজির প্রত্যক্ষ শোষণ ও পরোক্ষ শাসন। তৃতীয় বিশ্ব তাই আজ চরম উন্নয়ন সংকটের সম্মুখীন- আজ তারা দিশেহারা। ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদকে তারা কাজে লাগাতে পারছে না। অভ্যন্তরীন সম্পদকে কাজে লাগিয়েও যে উন্নয়ন করা যায় Globalization এর স্বপ্নে তারা তা আজ ভুলে গেছে। ফলে বিশ্ব মানচিত্রে কেবল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় পুঁজিবাদেi Globalization এর মোড়কে নব্য সাম্রাজ্যবাদই তাদের উপর অগাধ রাজত্ব করে যাচ্ছে এবং উন্নত দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের ভোক্তা শ্রেণীতে পরিণত করে তাদের দূর্বল দেহের রক্ত চুষে পান করছে। ফলে অনুন্নত দেশের কলকারখানাগুলো অবাধ প্রতিযোগিতারয় টিকে থাকতে না পারায় তা দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে পুঁজিবাদীরা নবীন দেশগুলোর উপর থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদের পতাকা তুলে নিলেও অর্থনৈতিক হাতিয়ারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃক বজায় রেখে চলেছে। এজন্য দরকার এর আশু পরিবর্তন। তা না হলে অনুন্নত দেশগুলোর ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় দেশীয় পন্য টিকে থাকতে পারবে না। বিশ্ব ব্যাংকের দেয়া কাঠামোগত সংস্কার নীতি দেশকে বিশ্বায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং, এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বিশ্বায়নকে যত নব নব সম্ভাবনার কথা বলেই তৃতীয় বিশ্বে প্রয়োগ করা হোকনা কেন অদূর ভবিষ্যতে তা এখানকার সবকিছুকে গ্রাস করে নিবে। সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের ন্যায় বিশ্বায়নও যে দারিদ্র্যের জন্য মরণ ফাঁদ এতে আদৌ সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য-

বিশ্বায়ন হল পুঁজিবাদের একটি নয়া অর্থনৈতি কৌশল। নিম্নে বিশ্বায়নের কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হল।

১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ ঃ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশ। সারাবিশ্বকে একত্রিত করার জন্য প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করা হয় ঔপনিবেশিক আমল থেকে। পঞ্চাশের দশকের রেডিও তারও পরে টেলিভিশন এবং বিংশ শতাব্দীতে কম্পিউটার যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক সেতুবন্ধন রচনা করে। শুধু তাই নয় মাত্র ত্রিশ বছর আগে আবিষ্কার এবং চালু হয় ইন্টারনেট। বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ভিত্তিক টেলিফোন এক বিরাট বিস্ময়কর বিষয়বস্তু-যা সমগ্র বিশ্বকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে।

২। বহুজাতিক সংস্থা গড়ে তোলা ঃ বিশ্বায়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিশ্বে বহুজাতিক সংস্থা গড়ে তোলা। যা অর্থনৈতিক একীভবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কারণ বহুজাতিক সংস্থা একদেশের প্রযুক্তি ও ব্যবসা কৌশল অন্য দেশে প্রচার করে তার প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ইউরোপে এবং ৭০ সালের পর ইউরোপীয় সংস্থাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদন শুর" করে। যা সমগ্র দেশগুলোকে একই অর্থনৈতিক সূত্রে বেঁধে ফেলে।

৩। পরিবেশের সংকট মোকাবেলা করা ঃ বর্তমান আধুনিকায়ন কিছু দেশের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এবং কিছু দেশের জন্য আর্থিক ঝুঁকি আনয়ন করে। শুধু তাই নয় বিশ্বায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে ফলে যে কোন সময় পরিবেশগত সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া আধুনিক সমাজের মানুষের জ্ঞান সৃষ্টি করেছে অনিশ্চয়তা ও ঝুকিপূর্ণ পরিবেশ। যেমন- আণবিক বিষ্ফোরণ, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিভিন্ন ফল সব মানুষের জন্য ঝুঁকিস্বরূপ। যা কোন একটি দেশের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এরকম সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী সহযোগীতা।

৪। সামাজতন্ত্রের মন্থর গতি ঃ ৯০-এর দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের মধ্যদিয়ে গোটা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের গতি কিছুটা স্ড়িমিত হয়ে যায়। আর এ জায়গা দখল করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এ বিকাশের ফলে বিশ্বায়নের পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়।

৫। সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্চাভিলাষ ঃ বিংশ ও একবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের আশা-আকাঙ্খা এখন ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোটা বিশ্ব এখন তাদের হাতের মুঠোয়। অনায়াসে তারা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যকলাপ। ফলে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার এবং বিকাশ সাধিত হচ্ছে বিশ্বায়নের ধারণার প্রসার।

৬। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন স্পৃহা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলো ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে লক্ষ্য না করে চলমান উন্নয়নকে ধরে রাখার জন্য বিশ্বায়নকে স্বাগত জানায়। ফলে তাদের উন্নয়নমুখী স্পৃহার জন্য বিশ্বায়নের বিকাশ সাধিত হয়।

৭। বিশ্ব সামজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী ও পরিবর্তনহীন বলে কিছু নেই। আজ যা হয়ত উন্নতির শীর্ষে বলে প্রতীয়মান, কাল হয়ত তার অস্তিত্ব লোপ পাবে। প্রকৃতির এ সাধারণ নিয়মের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে পরিবর্তন হচ্ছে সামাজব্যবস্থার। যার ফলে বিশ্বায়নের বিকাশ সাধিত হচ্ছে।

৮। জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন ঃ বিগত কয়েক দশক আগে মানুষের যে মানসিকতা ছিল তাএখন আর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষও নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে আর পুরাতনকে বিদায় জানাচ্ছে। ফলে বিশ্বায়নের ধারণা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৯। গণতন্ত্রের বিস্তার ঃ একসময় গোটা বিশ্বে রাজতন্ত্রের জোয়ার ছিল। রাজতন্ত্রের জোয়ারের কালে বিশাবায়নের ধারণা ততটা ছিল না। কিন্তু একবিংশ শতকে গণতন্ত্রের অবাধ প্রসার সাধিত হয়েছে। আর গণতন্ত্রের প্রসার বিশ্বায়নের বিস্তারে কিছুটা অবদান রাখছে।

১০। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অবাধ প্রসার ঃ বর্তমানে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অবাধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অবাধ প্রসারের ফলে আজ গোটা বিশ্বের মানুষ একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। ফলে প্রকারান্তরে বিকাশ সাধিত হচ্ছে বিশ্বায়নের ধারণার।

বিশ্বায়নের সুবিধা

বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয় হল বিশ্বায়ন। নিম্নে বিশ্বায়নের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করা হল ঃ

১। পণ্য ও সেবার অবাধ বিনিময় ঃ বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান শর্তই হল উমুক্ত ব্যবসার কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়া। মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও মুক্ত ব্যবসার নিশ্চিতকরনের জন্য পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারীকরণ (Liberalization) নীতি ও অবাধ ব্যবসায় নীতি প্রচলন করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের পণ্য ও সেবা ভোগ করা যায়। এতে মানুষের রুচি, অভ্যাস ও ভোগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

২। বৃহদায়তন উৎপাদনঃ বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী পণ্যের বাজার বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় পণ্যের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যায়। এতে উৎপাদন ব্যয় কমে যায় এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৩। পুঁজির গতিশীলতা ঃ বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীব্যাপী পূঁজির অবাধ সম্প্রসারণ হয়ে থাকে। ফলে উন্নত দেশ হতে অনুন্নত দেশ পূঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। ফলে অনুন্নত দেশে পর্যাপ্ত পূঁজির সমাবেশ ঘটে। এতে সংশ্লিষ্ট দেশে শিল্প গড়ে ওঠে এবং বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

৪। প্রযুক্তির বিকাশ ঃ বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের প্রতিটি দেশ পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ লাভ করে। এতে তাদের মধ্যে প্রযুক্তির হস্তান্তর করা সহজ হয়। বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশের প্রযুক্তি সহজেই আমদানি করতে পারে। ফলে অনুন্নত দেশগুলো জীবন যাত্রার মনোন্নয়নে সক্ষম হয়।

৫। বাজার সম্প্রসারণ ঃ বিশ্বায়নের অর্থ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বাজার গড়ে উঠা। অর্থাৎ এতে যে কোন দেশ যে কোন সময় পৃথিবীর যে কোন বাজারে প্রবেশিধাকার লাভ করে। ফলে পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নাফটা, সাফটা, আসিয়ান, ইউরোপীয় বাজার প্রভৃতি বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি।

৬। একচেটিয়া বাজারের অবসান ঃ বিশ্বায়নের ফলে একচেটিয়া বাজারের অবসান হয়ে থাকে। কারণ এর সুবাদে সকলেই সব ধরণের বাজারে প্রবেশাধিকার লাভ করে। যে কোন দেশ ইচ্ছা করলেই এককভাবে বাজার দখল করে রাখতে পারে না। এতে পণ্যের দাম যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়।

৭। দারিদ্র্য দূরীকরণ ঃ বিশ্বায়নের ফলে ধনী ও উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ করে থাকে। এতে অনুন্ড় দেশে বিভিন্ন ধরণের শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ফলে অনুন্নত দেশগুলো বেকারত্ব হ্রাসের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্ষম হয়।

৮। শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ ঃ বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান হয়ে থাকে এতে উন্নত দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুন্নত দেশে প্রসারিত হয়।

৯। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ঃ বিশ্বায়নের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যসামগ্রী, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাবের আদান-প্রদান হয়। এতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে বিশ্বশান্ড়ি, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

১০। শ্রমের অবাধ গতিশীলতা ঃ বিশ্বায়নের ফলে শ্রমের বাজার অবাধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এতে খুব সহজেই এক দেশের শ্রমিকগণ অন্য দেশে শ্রম বিক্রি করতে পারে। ফলে শ্রম ব্যবহারকারী ও শ্রম প্রদানকারী উভয় দেশই লাভবান হয়।

বিশ্বায়নের অসুবিধা

বিশ্বায়নের অসুবিধাসমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল-

১। পুঁজিবাদের প্রাধান্য ঃ বিশ্বায়নের সুযোগে সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর ধনী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এনে শোষণ করার মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করছে।

২। অসম প্রতিযোগিতা ঃ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশসমূহ সস্ড়ায় উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী অনুন্নত দেশে রপ্তানি করছে। ফলে গরিব ও অনুন্নত দেশের শিল্পসমূহ ধ্বংসের সম্মুখিন হওয়া ছাড়াগত্যন্ড়র থাকছে না।

৩। অর্থনৈতিক পোষণ ঃ বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে পুঁজি ও তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার অনুন্নত ও গরিব দেশগুলোর জন্য মোটেও অনুকূলে নয়। কারণ অর্থাভাবে তাদের পক্ষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। উন্নত ও ধনী দেশগুলোর পক্ষেই কেবল উন্নত প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল ব্যবহার করে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা এবং সেগুলো অনুন্নত ও গরিব দেশগুলোতে বিক্রয় করে মুনাফা লুটে নেয়া সম্ভব হবে। ফলে ধনী দেশগুলোর হাতেই সম্পদ জমা হতে থাকবে এবং অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত হবে।

৪। মেধা ও সম্পদ পাচার ঃ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শ্রম ও সম্পদের অবাধ চলাচলের সুযোগ গ্রহণ করে উন্নত দেশসমূহ গরিব ও অনুন্নত দেশ হতে নামমাত্র মূল্যে শ্রম ও সম্পদ ক্রয় করে নিজ দেশের উন্নয়নের ঘাটতি পূরণে ব্যবাহার করবে। এতে শ্রম প্রদানকারী গরিব দেশের চেয়ে শ্রম ব্যবহারকারী ধনী দেশ অধিকতর লাভবান হবে।

৫। দেশীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় ঃ বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহের ধর্মীয় মূল্যবোধহীন অপসংস্কৃতি অনুন্নত দেশসমূহে ছড়িয়ে দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতিকে কলুষিত করছে। ভিন দেশীয় সংস্কৃতির আমদানির ফলে অনুন্নত দেশগুলোতে সামাজিক অস্থিরতার জন্ম নিচ্ছে।

৬। তদারকি ব্যবস্থায় ত্রুটি ঃ বিশ্বায়নকে তদারক এবং সম্প্রসারণ করার জন্য গঠন করা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) যা শুধু ধনী ও পুঁজি সমৃদ্ধ দেশগুলোর অনুকূলে ও তাদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। ফলে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এ ধারার বিশ্বায়ন উদ্বেগ ও আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭। পরিবেশ বিপর্যয় ঃ বিশ্বায়নের দরুন বিশ্বব্যাপী সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার এবং অধিক উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের ফলে পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৮। দেশীয় শিল্প ধ্বংস ঃ বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশ তার উৎপাদিন পণ্য উন্নয়নশীল দেশের বাজারে অবাধে ক্ষেত্রবিশেষে ডাম্পিং দিয়ে প্রবেশ করাচ্ছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দেশীয় শিল্প বাজার হারাচ্ছে তথা প্রতিযোগিতার টিকতে পারছে না।

৯। দারিদ্র্য দূর হয় না ঃ বিশ্বায়নের ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা জোরেশোরে বলা হলেও বাস্ড়বে উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য দূর হয় না। কারণ বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলো সমন্বয় করতে পারে না। ফলে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় বিশ্বায়নের পক্ষে জেরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়ায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা

বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়ন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। আমাদের দেশের অথনৈতিক পন্ডিত থেকে রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত প্রত্যেকেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি পরিচালনায় বিশ্বায়নের কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখ করেন বিশ্বায়নের অমোঘ নিয়মের প্রতি এবং বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবার কথা। এটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে আমরা যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে সমস্ড় সামাজিক প্রক্রিয়া বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় জাতীয় অর্থনীত, জাতীয় সংস্কৃতি এমনকি জাতীয় ভৌগোলিক সীমারেখাগুলো মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের কি প্রভাব পড়ছে সেটা দেখা যায়। বাংলাদেশে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান পর্যায়ের সাথে যুক্ত হয় ৮০র' দশকের মাঝামাঝি থেকে। এরশাদের সামরিক শাসনকালে এসে বাংলাদেশ পুরোপুরি মুক্তবাজার অর্থনীতিক নীতি গ্রহণ করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে যার মূল বিষয় ছিল বিরাষ্ট্রীয়করণ, অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ক্রমাগত সংকুচিত করা, ব্যক্তিগতায়নকে উৎসাহিত করা; দ্বিতীয়ত, উদারীকরণ যার মাধ্যমে বাজারকে উন্মুক্ত করে দেয়া; তৃতীয়ত, সরকারী আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান যার মূল দিকগুলো ছিল ভর্তুকি প্রত্যাহার, উন্নয়ন ব্যয় কমানো এবং সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন করা। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের গড় আমদানী শুল্ক ছিল ৫৭.৩ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে সে আমদানী শুল্ক হার কমিয়ে ৩৬ শতাংশে আনা হয়। এভাবে বাংলাদেশের বাজার বিশ্বের জন্য রাতারাতি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে দেশীয় শিল্পগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়, ফলে বিপুল সংখ্যক শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বায়নের সফলতা হিসাবে গার্মেন্টস শিল্পকে অনেকে উল্লেখ করতে চান তবে এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের রপ্তানি আয়ের যে ৭৬ শতাংশ দিচ্ছে সেটা মোট মূল্য। এর দু-তৃতীয়াংশই ব্যয় হয় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে। গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশের মাত্র ২৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন হয়ে থাকে। পশ্চাৎ সংযোগের মাধ্যমে এ মূল্যসংযোজন যোজন বৃদ্ধির কথাবলা হলেও সেটা হয়েছে কম। ২০০৫ সালে কোটা সুবিধা ওঠে যাওয়ায়। গার্মেন্টস শিল্প ব্যপক প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গার্মেন্টস শিল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীদের সামনে নিয়ে এসছে। কিন্তু একই সাথে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া নারীর অবমাননাও ঘটিয়েছে দারুণভাবে। নারী এখন পরিপূর্ণ পণ্য। নারীর যৌনতার বাণিজ্যিক ব্যবহার বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইস্যু। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের নারীরাও আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারী ও দেহ ব্যবসায়ী চক্রের শিকার হচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থাসমূহের হিসেবে বাংলাদেশ থেকে প্রতি মাসে ২০০-৪০০ নারী ও শিশু পাচার হয়। ইউনিসেফ এর প্রোগ্রেস অফ নেশনস রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৯৫ সালে ৪০ হাজার বাংলাদেশী শিশু পাকিস্তানের পতিতালয়ে কর্মরত ছিল।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একই ভাবে বাংলাদেশের মানুষকে বহির্গমনমুখী করে তুলেছে। উন্নত জীবন ও কর্মসংস্থানের সুযোগে বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে। এদের একটা বড় অংশ অভিবাসন নিয়ে থেকে যাচ্ছে বিদেশে। বিশ্বায়নের এ প্রক্রিয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নিয়ে আসছে নানা পরিবর্তন।

বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটি উদ্বেগজনক বিষয় তা হল ধনী-দরিদ্রের আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি। ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০২-এর মতে, বিশ্বের ধনী ১ শতাংশ জনগন ৫৭ শতাংশ দরিদ্র জনগণের সমান আয় করে। আমেরিকার ধনী ১০ শতাংশ জনগনের আয় বিশ্বের ৪৩ শতাংশ দরিদ্র জনগণের আয়ের সমান। পৃথিবীর ৫ শতাংশ ধনী মানুষের আয় দরিদ্র ৫ শতাংশের ১১৪ গুণ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। ১৯৮৫-৮৬ সালে যখন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন বাংলাদেশের দরিদ্রতম ২০% জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ১৫৩১ টাকা আর ধনী ২০% জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ১০,০৮৫ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে দরিদ্রতম ২০% মানুষের আয় দাঁড়ায় ১৫৭১ টাকা আর ধনী ২০% জনগণেলর আয় দাঁড়ায় ১৩,৭৮২ টাকা। অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের সুবিধা আদায় করতে পেরেছে কেবল ধনীরাই এবং ধনী-গরীবের বৈষম্যও এতে করে বেড়ে গিয়েছে।

বিশ্ব যে ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে তাতে বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থার বাইরে থাকা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধে গড়ে উঠেছে তাতে ভরসাম্য গরিব দেশ ও গরিব মানুষের দিকে ফেরানোই বিশ্বায়ন এর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জর । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের মত বাংলাদেশের মানুষ দেশে, প্রবাসে উভয় ক্ষেত্রে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে, বিজয়ী হবে, এটাই সবার কামনা।

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.১

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বিশ্বায়ন বলতে কি বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

২। বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৩। বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষন করুন।

৪। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২ : বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দক্ষিন এশিয়ায় বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির(সাপটা) সম্ভবনা না যাচাই করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব

বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়ন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিও আজকে বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ পুরোপুরি অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। ফলে উদারীকরণ, কাঠামোগত সংস্কার, সরকারের আয় ব্যয় সমন্বয় ইত্যাদি কর্মসূচি বিশ্বব্যাংক ও আই.এম. এফ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাস্তাবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এমতাবস্থায় অর্থনীতিতে কিছু ইতবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) বিশ্বায়নের সুবিধাসমূহ :

১। রপ্তানি বৃদ্ধি ঃ বিশ্বায়ন তথা বাজার অর্থনীতির ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সস্তায় বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমাদানীর ফলে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা অধিক মাত্রায় রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসছে ফলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২। অর্থ বাজারের উন্নয়ন ঃ বিশ্বায়নের প্রভাবে দেশের অর্থ বাজারে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। দেশে অনেকগুলো বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এদের শাখার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সরকারের উদার অর্থনৈতিক কর্মসূচি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

৩। বিদেশী বিনিয়োগ ঃ বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছৈ। সরকারের উদার বাণিজ্যনীতি, সরকারি বিধি নিষেধ শিথিলকরণ, ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহ দান প্রভৃতি কর্মসূচি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

৪। তথ্য প্রযুক্তি ঃ বিশ্বায়নের সুফল হিসেবে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। টেলিফোন, ইন্টারনেট, বিশেষত মোবাইল ফোনের জগতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অল্প-সময়ে স্বল্প পয়সায় এখন দেশ-বিদেশের যে কোন জায়গায় যোগাযোগ করা যায়।

৫। বহির্গমন মুখীতা–বৃদ্ধি ঃ বিশ্বায়ন বাংলাদেশের মানুষকে বহির্গমনমুখী করে তুলেছে। উন্নত জীবন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগে বাংলাদেশের গ্রাম- গ্রামান্তর থেকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদ্দেশ্যে। এর ফলে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি বছর দেশে পাঠাচ্ছে।

৬। উন্নত প্রযুক্তি ঃ বিশ্বে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে ঐ সকল উন্নত প্রযুক্তি অতি সহজে আমাদের দেশে আসছে।

৭। আন্তর্জাতিক মান ঃ পূর্বে দেশে সংরক্ষিত বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ফলে দেশীয় শিল্পসমূহের আন্তর্জাতিক মান অনেক ক্ষেত্রেই ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের কারণে বিদেশী শিল্পের সাথে প্রতিযোগীতার লক্ষ্যে দেশীয় শিল্পসমূহ উন্নত তথা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হবে।

(খ) বিশ্বায়নের অসুবিধাসমূহ :

১। দেশীয় শিল্প-ধ্বংস ঃ বিশ্বায়নের ফলে অবাধে বিদেশী তথা চীন, ভারত, মালয়েশিয়া,দক্ষিন কোরিয়া, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের পণ্য দেশে প্রবেশ করছে। ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ বাজার হারিয়ে রুগ্ন শিল্পে পরিনত হচ্ছে।

২। বিলাস দ্রব্যের উপস্থিতিঃ বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণনে মুনাফা বেশী। তাই বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাজারে আজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তুলনায় বিলাস দ্রব্যের উপস্থিতি বেশী। কারণ অধিক মুনাফার আশায় দেশীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা বাজারে বেশী বেশী বিলাস দ্রব্যের যোগান দিচ্ছে।

৩। নারীর অবমাননা ঃ ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া নারীর কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও ইহা নারীত্বের অবমাননা ঘটিয়েছে দারুণভাবে। উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের নারীরাও আন্তর্জঅতিক নারী পাচারকারী ও দেহ ব্যবসায়ী চক্রের শিকার হচ্ছে।

৪। আয় বৈষম্য বৃদ্ধি ঃ বিশ্বায়নের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল ধনী দরিদ্রের আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি। ইউ.এন. ডিপির মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার ধনী ১০% জনগণের আয় বিশ্বের ৪৩% দরিদ্র জনগণের আয়ের সমান। অর্থাৎ ২৫ মিলিয়ন আমেরিকানের আয় পৃথিবীর ২ বিলিয়ান লোকের সমান। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একথাটি সত্য। ১৯৮৫-৮৬ সালে যখন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন বাংলাদেশের দরিদ্রতম ২০% জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ৫১৩১ টাকা আর ধনী ২০% জনগনের মাথাপিছু আয় ছিল ১০,০৮৫ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ সালে দরিদ্রতম ২০% মানুষের আয় দাঁড়িয়েছে ৫১৭১ টাকা। অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের সুবিধা কেবল মাত্র ধনীরাই আদায় করতে পেরেছে এবং ধনী গরীবের আয় বৈষম্য বেড়ে গেছে।

৫। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বজুড়ে মার্কিনী তথা পশ্চিমা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। সাংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে মার্কিনীকরণ ঘটেছে তার দুটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। (ক) নৃশংস সংস্কৃতির বিকাশ যা খুন বৃদ্ধি করেছে। (খ) যৌনতার বিষয় যা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব :

গ্যাট থেকে নানা প্রক্রিয়ায় পেরিয়ে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। একই সঙ্গে সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির মত বস্ত্র ও পোশাক খাতের চুক্তি ÔThe Agreement on Textile And Colothing' (ACT) নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার আওতায় বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র বাণিজ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এর ২০ বছর পূর্বে থেকেই গ্যাটের মূল নীতিমালার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের বিশেষত উন্নয়নশীল দেশকে রপ্তানি সুবিধা দেওয়ার জন্য Aggrement Regarding Multi-fibre Arrangement in Textile নামে একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এর আওতায় মূলত আমেরিকার বাজারে বিভিন্ন দেশকে বস্ত্র তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য কোটা সুবিধা দেওয়া হয়। যা দ্বিপাক্ষীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যেহেতু বিভিন্ন দেশ এ ব্যবস্থার সঙ্গে একমত পোষণ করে সেহেতু একটি Multi-fibre Arrangement (MFA) নামেও পরিচিতি লাভ করে।

এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পক্ষে যুক্তি ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানির একটা অংশ আসে এই টেক্সটাইল ও পোশাক পণ্য থেকে। ফলে অবাধ বাজারে এসব দেশ বেকায়দায় পড়ে যেতে পারে এমন একটি ধারণা থেকে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে কোটা সুবিধা প্রবর্তন করা হয়। একই সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলো চাচ্ছিল নিজেদের দেশের পোশাক খাতকে কিছু বাড়তি সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়ার জন্য। কোটা ব্যবস্থা সেই সুযোগ করে দেয়।

কোটামুক্ত ব্যবস্থা কালক্রমে :

পর্যায়	সময়সীমা	কোটা প্রত্যাহারের হার
প্রথম	১ জানুয়ারী, ১৯৯৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	১৬ শতাংশ
দ্বিতীয়	১ জানুয়ারী, ১৯৯৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০১	১৭ শতাংশ
তৃতীয়	১ জানুয়ারী, ২০০২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪	১৮ শতাংশ
চতুর্থ (চূড়ান্ড়)	১ জানুয়ারী, ২০০৬	৪৯ শতাংশ সর্বোচ্চ

১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত গঋঅ- এর পর ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯১, ও ১৯৯২ সালে মোট চারবার কোটাসুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। অবশেষে ১৯৯৫ সালে বিশ্ববানিজ্য সংস্থার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, ১০ বছরের মধ্যে চার পর্যায়ে কোটা সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে এবং এই সময়কালে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশগুলো পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থার আওতায় তাদের বস্ত্র ও তৈরী পোশাক বাণিজ্য সম্পৃক্ত করে ফেলবে। এর অর্থ হল, বিশ্ববাজারে সব দেশই সমানভাবে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবে। তবে শুল্ক হ্রাসের বিষয়ে যেহেতু কোন চুক্তি হয়নি, সেহেতু আমদানিকারক দেশগুলো নিজেদের পছন্দমতো শুল্ক বাড়িয়ে বা কমিয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়ে যায়। গঋঅ-১০ এর আওতায় আমেরিকাসহ আটটি আমাদানিকারক দেশ ৩৬টি দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্রসামগ্রী ঐসব দেশের বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রবেশের সুযোগ দিতে বিভিন্ন হারে কোটা আরোপ করে।

বিশ্ব বাণিজ্যে বস্ত্র বাণিজ্য একটি বড় ব্যবসা। বিশ্ব বাণিজ্যে মোট রপ্তানিতে বস্ত্র খাতের অংশ হচ্ছে ৬ শতাংশ, কর্মসংস্থান হয়েছে ২০০ দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ। ১৯৬২ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে এই খাতের বাণিজ্য ৬০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪২ বিলিয়ন ডলার। উন্নয়নশীল বিশ্বই এই বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভাগ নিচ্ছে। এ সময় পোশাক ব্যবসায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ডিলডেগান কেইভিক নরডাসের সমীক্ষায় দেখা যায়, কোটা সুবিধা ওঠে যাওয়ার পর পোশাক ও বস্ত্রসহ শিল্প খাতে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাণিজ্য বাড়বে। বিশেষ করে বস্ত্র ও পোশাক খাতে কোটা পরবর্তী সময়ে রপ্তানির পরিমান ১৭.৫ থেকে ৭৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্যে ১৭.৫ শতাংশ স্থিতিশীল এবং ৭২.৫ শতাংশ গতিশীল পদক্ষেপের উপর নির্ভর করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে (EU) কোটা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে শিথিল থাকবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন রুলস অব অরিজিনের শর্ত সন্তোষজনক হওয়ার শর্তে বেশ কিছু স্বল্পোন্নত দেশকে (LDC) শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজারের প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

কোটামুক্ত বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থায় পোশাক ও বস্ত্রবাণিজ্যে চীন সবার শীর্ষে অবস্থান করবে। এরপরই অবস্থান করবে ভারত ।

কোটামুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থায় উন্নয়শীল দেশগুলোর পরিস্থিতি- কেসস্টাডি বাংলাদেশ

তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। এ খাত থেকে মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ আসছে এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) প্রায় ৫ শতাংশ অবদান রাখছে। তৈরি পোশাক শিল্প দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের আয় বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এখাতে সরাসরি প্রায় ১৮ লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে, যার ৯০ শতাংশ মহিলা।

রপ্তানির পরিমাণ হিসেবে দেখা যায়, বিগত ২০ বছরের ব্যবধানে এ খাতে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ৪০০ শতাংশ। ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ ১৩ কোটি ১০ লাখ ডলার আয় করে। বর্তমানে গড়ে বার্ষিক ১৪ কোটি ডজন তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার আয় হচ্ছে।

এদিকে ১ জানুয়ারী, ২০০৫ এ কোটা সুবিধা ওঠে যাওয়ায় বস্ত্রখাতে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তনি কমার আশংকা করছে।

কারণ কোটা ওঠে যাওয়ার অতীত অভিজ্ঞতা ভাল নয়। ১৯৯৫ ও ৯৭ সালে দু'দফা কোটা ওঠে গেলেও সেসব ক্যাটাগরির পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করত না। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, বাংলাদেশ তার বাজার হারিয়েছে। বাংলাদেশের গবেষকেরা দেখিয়েছেন, কোটা ব্যবস্থা ওঠে গেলে বন্ধ হয়ে যাবে কয়েক হাজার ফ্যাক্টরী, বেকার হয়ে পড়বে লাখো শ্রমিক। গবেষণা সংস্থা `Centere for Policy-Dialouge'- এর গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, কোটা ওঠে গেলে সার্বিকভাবে রপ্তানি খাতে তেমন কোন সমস্যা দেখা দেবে না। তবে সংকটে পড়তে পারে ছোট ছোট পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলো।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বায়ন এর প্রভাব

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল-হক প্রতিষ্ঠিত Human Development Center (HDC) থেকে প্রতিবছর Human Development In Southe Asia নামে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় যার বাছাইকৃত বিষয় হল বিশ্বায়ন। (Globalization) বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অভিজ্ঞতা উৎসাহব্যঞ্জক নয়- রিপোর্টে বলা হয়, জনগণের ইতিবাচক উন্নয়ন যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল বিশ্বায়ন দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোর মানুষকে তা না দিয়ে দারিদ্রতাই উপহার দিয়েছে। বিশ্বায়নের সুফল গিয়েছে শুধু একটি বিশেষ শ্রেণী ও শহরের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন ও মান সম্পদ উন্নয়ন রিপোর্টের প্রথম বার্তা হচ্ছে বিশ্বায়নের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার কমপক্ষে ৫০ কোটি মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্বায়নের সামাজিক মূল্যের সবটুকুই দিচ্ছে গরিবরা। চিন্তার বিষয় যে, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বাড়ছেই এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক যা ৬০ এর দশকে বেড়েছিল, তা এখন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায়। কারণ দেশেগুলোর আয়ের স্ড়র বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদন, সংস্কার এবং বিশ্ব বাণিজ্যে দেশীয় রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পর্কিত। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো উল্লেখ করার মত অগ্রগতির অর্জন করতে পারে নি। রিপোর্টে দ্বিতীয় বার্তা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন একটির সাথে আরেকটির সমান গতিতে আগানো উচিত। এ জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন দেয় সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা যা দেশগুলোকে বিশ্বশ্রম বাজারে প্রতিযোগী হিসেবে অভ্যুদয়ে সাহায্য করবে। এখানে সরকার গুলোর জন্য সতর্ক বার্তা হলো তারা উচ্ছাসের সাথে নিজেদের সামর্থ বিচার না করেই তাদের বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। রিপোর্টের তৃতীয় বার্ত হচ্ছে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফেরামকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্ড়র ছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দর কষাকষির ক্ষমতা অর্জনের তাগিদ। কিন্তু দক্ষিণ এশিয় দেশগুলো বৈশ্বিক স্ড়র তো দূরের কথা, আঞ্চলিক স্তরের পাক-ভারত শত্রুতা এবং আধিপত্যবাদী মনোভাবের দরুন এশিয়ার দেশগুলো এ বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারে নি। বিশ্বায়নের বিষয়টি দক্ষিণ এশিয়ার বাজার ভিত্তিক ফোকাস বেশি পেয়েছে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়াই। এতে মূলধন হয়তো স্বাধীনভাবে স্থানান্ড়র হয়েছে কিন্তু শ্রমের স্থানান্তর হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রধানত ভারত থেকে বিহিবিশ্বে বেশির ভাগ দক্ষশ্রমিক পাড়ি জমাতে পেরেছে, কিন্তু অদক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিকেরা ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের বাজার উন্মুক্ত করার পর তাদের অভ্যন্তরীন বাজারকে নিক্ষেপ করেছে কঠিন বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সামনে; যার ফলে প্রচুর কল- কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অপর দিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর বানিজ্যিক সংরক্ষণবাদ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর লেবার ইনটেনসিভ পন্য রপ্তনি সীমাবদ্ধ করে এর মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু তথ্য প্রযুক্তি খাত। বিশ্বায়নের বড় রকমের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে এই খাতটি এগিয়ে রয়েছে, তবে জি.ডি. পিতে খাতের অবদান কম। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পখাত, বাণিজ্যক খাত, সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি দূর্বল হচ্ছে কাঠামোগত সংস্কার এর কারণে যা এখন দক্ষিণ এশিয়ায় চলমান। দেশগুলোর রপ্তানি এখনও প্রধানত ম্যানুফ্যাকচারিং ও সার্ভিস খাতে বন্দী এবং গন্তব্য যথারীতি মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও ইউরোপী ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলো। রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক হারের দ্রুত বৃদ্ধি ও মুদ্রার বিনিময় হারের গতির কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে।

এটা অবশ্যই চিন্ড়র বিষয় যে এ অঞ্চলের এক পঞ্চমাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এহেন অব্যবস্থার দরুন শেষ পর্যন্ড় তা যে বিপর্যয় ডেকে আনবে তা গরিব জনগনের ঘাড়েই এসে পড়েবে। বিশ্বায়ন ও মানব উন্নয়ন রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে তা হল গত দেড়যুগে যে সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে তা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও পাকিসড়নের প্রবৃদ্ধি হবে রাহুর দশা। একমাত্র ভারতই ৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তবে ভারতসহ অপর দেশগুলোর সংস্কার সঠিক প্রমাণিত হয়নি। শুল্কের তালিকা সংকোচন করার পর করারোপ বাড়ানো যেতে পারে, এত করে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে, কিন্তু এটা কোন দেশেই হয়নি। কৃষি খাতের সাফল্যও হতাশাব্যঞ্জক। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষনের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়া পশ্চাৎপদ দেশ হিসেবেই বাংলাদেশ পরিচিতি রয়েছে। এটা আরো তাৎপর্যপূণ যে, বিশ্বায়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন রিপোর্টে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে একই অর্থনৈতি চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে এবং রিপোর্ট সংকেত দেয় যে শুধু শক্তিশালি অর্থনৈতিক ফোরাম গঠনই যথেষ্ট নয়, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সার্ক কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রাধিকার মূলক বানিজ্য চুক্তি (সাপটা)

আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার কারর লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে গঠিত হয় সার্ক (SAARC) । সার্কের চেতনা বাস্ড়বায়ন এবং ঘঅঋঞঅ, খঅঋঞঅ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতাদি সংগঠনের জন্ম ও তার অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৯৫ সালে সাপটা গঠিত হয়।

সার্ক গঠনের সময়ে অর্থায়ন, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য উদারীকরণের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাই পরবর্তীতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্যনীতি অনুসরণে সম্মত হয়। ফলে ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্কের সম্মেলনে ঝঅচঞঅ এর রূপ রেখা উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৫ সালে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে সদস্য সাতটি দেশ চূড়ান্তভাবে SAPTA অনুমোদন করে। সাপটা হল দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য চুক্তি। সার্কের অন্ড়র্ভূত দেশগুলোর মধ্যে সুদৃঢ় বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা সাপটা চুক্তির মধ্যে নিহিত। ৫৭১ টি দ্রব্য চিহ্নিত করা হয়েছে যা সার্কের দেশগুলোর মধ্যে অবাধে বা নূন্যতম শুল্ক সাপেক্ষে চলাচল করতে পারে। সার্কভুক্ত অঞ্চলে ২২৬ টি পণ্যের তালিকা প্রাথমিক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যেগুলোতে শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, পাকিস্তান কৃষিদ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনৈতিক সুবিধা আছে। তাই সার্কের বাণিজ্য মন্ত্রীরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে পারস্পরিক ভাবে বানিজ্য উদারীকরন হলে সবাই তার দ্বারা উপকৃত হবে।

সমালোচনা ঃ সাপটা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো নিম্নরূপঃ

প্রথমত, সার্কের বাণিজ্য শক্তিধর দেশ বারত। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শিল্পগুলো যা এখনও কার্যত শিশু পর্যায়ের, অবাধে এবং সন্ড়ায় অপর দেশের পন্য বাজারে এসে গেল এই শিল্পগুলো ভেংগে পড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত, সার্ক অঞ্চলে পরস্পরের উচ্চ শুলক্ হার থাকায় পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশগুলোর মাঝে সুসম্পর্ক নেই। তাছাড়া সার্ক অঞ্চলের সবকটি দেশ কৃষি প্রধান। ফলে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে।

তৃতীয়ত, সার্ক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসও লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক অবিশ্বাস অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

শেষ কথা, বাণিজ্য বাধা থাকবেই তাই বলে নিচেস্টা থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। সাপটার মাধ্যমে শুল্ক ছাড়প্রাপ্ত দ্রব্যের সংখ্যা যদি বাড়ে তবে সবগুলো দেশ উপকৃত হবে। সুতরাং, একটি গতিশীল মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠনই হল সাপটার (SPATA) সুদূর প্রসারী লক্ষ্য।

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়নঃ ১৩.২

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষন করুন ।

৩। দক্ষিন এশিয়ায় বিশ্বায়নের প্রভাব বর্ণনা করুন ।

৪। দক্ষিন এশিয়ার অগ্রাধিকার বানিজ্য চুক্তি (সাপটা)র ভূমিকার মূল্যায়ন করুন ।

পরিশিষ্ট-০১

কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ :

বাংলাদেশে কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপদান ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ দেয়া হলঃ

প্রধান প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমি

বছর	আউশ		আমন		বোরো		গম		বার্লি		তামাক		ডাল		তৈলবী	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উ
১৯৮৯/৯০	৫৫.৯৩	২৪.৮৮	১৪০.৯৫	৯২.০৯	৬২.০৫	৬১.৬৭	১৪.৬৩	৮.৯০	০.৪৬	০.১২	১.১১	০.৪১	১৮.২৩	৫.১২	১৪.১৮	৪
১৯৯০/৯১	৫২.১৬	২৩.২৮	১৪২.৭৩	৯১.৬৭	৬২.৯৭	৬৩.৫৭	১৪.৮০	১০.০৪	০.৪৪	০.১১	০.৯৪	০.৩৪	১৭.৯৯	৫.২৩	১৪.০৭	৪
১৯৯৪/৯৫	৪১.১১	১৭.৯১	১৩৮.২৪	৮৫.০৪	৬৫.৮২	৬৫.৩৮	১৫.৮০	১২.৪৫	০.২৩	০.০৬	০.৮৯	০.৩৮	১৭.৫৫	৫.৩৪	১৩.৮১	৪
১৯৯৫/৯৬	৩৮.১০	১৬.৭৬	১৩৯.৫৩	৮৭.৯০	৬৮.০৪	৭২.২১	১৭.৩২	১৩.৬৯	০.২৩	০.০৬	০.৯০	০.৩৯	১৭.২৫	৫.২৫	১৩.৭০	৪
২০০০/০১	৩২.৭৪	১৯.১৬	১৪১.১০	১১২.৪৯	৯২.৯৫	১১৯.২০	১৯.০৯	১৬.৭৩	০.১৪	০.০৪	০.৭৪	০.৩৭	১১.৭০	৩.৬৬	১০.৪০	৩
২০০১/০২	৩০.৬৯	১৮.০৮	১৩৯.৫৫	১০৭.২৬	৯৩.১৯	১১৭.৬৬	১৮.৩৩	১৬.০৬	০.১০	০.০৩	০.৭৫	০.৩৮	১০.১৬	৩.৪২	৯.০৯	২
২০০৭/০৮	২২.৭০	১৫.০৭	১২৪.৭৪	৯৬.৬২	১১৩.৮৫	১৭৭.৬২	৯.৫৮	৮.৪৪	০.০২	০.০১	০.৭২	০.৪০	৫.৫৮	২.০৪	৮.৩৪	৩
২০০৮/০৯	২৬.৩৩	১৮.৯৫	১৩৫.৮৫	১১৬.১৩	১১৬.৫৪	১৭৮.০৯	৯.৭৫	৮.৪৯	০.০২	০.০১	০.৭৪	০.৪০	৫.৫৯	১.৯৬	৮.৩৪	৩

উৎস: বিভিন্ন সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষ